

ময়মনসিংহ বিভাগের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। মহান এই যুদ্ধে দেশব্যাপী অসংখ্য রণাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে জাতির জন্য আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত এবং বিজয় গাঁথার সৃষ্টি করেছেন।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সুপ্রাচীন কাল হতেই ময়মনসিংহ অঞ্চল ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ অহংকার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ময়মনসিংহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হলো প্রতিরোধ ও বিজয় অর্জনের এক গৌরবগাঁথা। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং তা ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার শহর-বন্দর-গ্রাম এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। মহান মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ জেলা ১১নং সেক্টরের অধীন ছিল। ১১নং সেক্টরের মধ্যে যে সকল অঞ্চল ছিল তা হলো- ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জের পশ্চিম অঞ্চল ও কুড়িগ্রাম জেলার যমুনার পূর্ব তীরস্থ অঞ্চল। এ সেক্টরের প্রধান কার্যালয় ছিল মহেন্দ্রগঞ্জ, জামালপুর। সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে- কর্ণেল আবু তাহের ও হামিদুল্লাহ খান। এ অঞ্চলের যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঢালু ইয়ুথ ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান ও মহেশখোলা ইয়ুথ ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন- আনিসুর রহমান। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিলো প্রায় ৫ হাজার।

ময়মনসিংহের আপামর জনতা সক্রিয়ভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় এ অঞ্চলে। মার্চের শুরুতেই পাক হানাদার বাহিনীর সাথে প্রথম বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়।



মধুপুর যুদ্ধ:

ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসররত পাক সেনাদের প্রতিহত করার জন্য পুলিশ, বিডিআর, ছাত্র-জনতা মধুপুর ব্রিজের পূর্ব পাশে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে থাকে। ১৩ এপ্রিল মধুপুর যুদ্ধের পর পাকসেনাদের মুহূর্তে স্বয়ংক্রিয় ভারী অস্ত্রের আক্রমণে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হঠতে থাকে।

ময়মনসিংহে বিমান হামলা:

পাক সেনারা মধুপুর এবং গফরগাঁও হয়ে ময়মনসিংহের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে নেতৃবৃন্দসহ ময়মনসিংহ শহরের আপামর জনতা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে ময়মনসিংহ শহর জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ পাকহানাদার বাহিনী বিমান বাহিনীর সহায়তায় ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশের চেষ্টা চালায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাশে বাসষ্ট্যান্ডে এবং চলাচলরত নৌযানের উপর বিমান হামলা চালায়। এতে করে প্রায় ৭টি বাস ভস্মিভূত এবং কয়েকজন লোক আহত হয়। অতঃপর ময়মনসিংহ থেকে সড়ক পথে হালুয়াঘাট হয়ে কড়ইতলী সীমান্ত ফাঁড়িতে বিডিআর ও ছাত্র-জনতা সমবেত হতে থাকে। পশ্চিমমুখে হালুয়াঘাট খাদ্য গুদাম থেকে এক বাস ভর্তি করে খাদ্য নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা কড়ইতলীর ক্যাম্প ত্যাগ করে ২৭ জন বিডিআর ও ১০/১১ জন ছাত্র-জনতা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে পানিহাটা মিশনের পশ্চিমে গারো হাইড আউট গড়ে তোলে। এখান থেকে মাঝে মাঝে রামচন্দ্রকুড়া, হাতিপাগার, তন্তরসহ বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি ও শত্রু সেনাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ২৪ মে ১৯৭১ তারিখে অতর্কিতে পাকসেনারা মর্টারের গোলাবর্ষণ করে পানিহাটা মিশন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাইড আউটে আক্রমণ চালায়। প্রত্যুত্তরে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ রামচন্দ্রকুড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের হটিয়ে দিয়ে সীমান্ত ফাঁড়ির সমস্ত ডেউ টিন খুলে এনে নিরাপদ আশ্রয়ের বেড়া সৃষ্টি করে। ২৫ মে পাকিস্তানী বাহিনী অতর্কিতে বেপরোয়া গোলাগুলির মধ্য দিয়ে ভারতের ঢালু নামক স্থানে প্রবেশ করে নিরীহ শরণার্থীদের নির্বিচারে হত্যা করে।

কামালপুর যুদ্ধ:

৩১ জুলাই সন্ধ্যার পর এ্যাসেম্বলি এরিয়া হতে নির্দিষ্ট পথে কোম্পানি কমান্ডারের নিজ নিজ সৈন্যসহ কামালপুর, জামালপুর এর দিকে যাত্রা শুরু করে। হঠাৎ নামা বৃষ্টিতে সৈন্যদের চলার গতি শ্লথ হওয়ায় বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কামালপুর-ঝিনাইগাতী রাস্তা পার হয়ে পাকসেনাদের আউটার পেরামিটার ডিফেন্সে প্রবেশ করলে এমজি ফায়ারের সম্মুখীন হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রবল চাপে পাক সেনারা প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করতে না পারলেও অদম্য মনোবল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল।

নালিতাবাড়ী ব্রিজ ধ্বংস:

ইতোপূর্বে কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর ২২ মে ৪টি কোম্পানীর সম্মিলিত প্রয়াসে অত্যাধুনিক বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে নালিতাবাড়ী ব্রিজটি ধ্বংস করা হয়।

তেলিখালী যুদ্ধ:

হিট এন্ড রান অর্থাৎ মার এবং পালাও পদ্ধতির পরিবর্তে মার এবং জায়গা দখলে রাখ এই পদ্ধতি গ্রহণ করে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী দীর্ঘ ৭ দিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধে যাবার একদিন আগে ব্যাটালিয়ানের বিভিন্ন কোম্পানীতে সংযুক্ত কমান্ডারগণকে যুদ্ধের পরিকল্পনাসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে যুদ্ধে যাবার পূর্বে

স্ব-স্ব কোম্পানীর অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি অবহিত করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ে যুদ্ধ যাত্রা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করার সময় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ডি কোম্পানী ১২৫ জন সৈনিক রেঞ্জার্স ও রাজাকারসহ লোকবল ছিল ২৩৭ জন। অন্যদিকে ভারতীয় ব্যাটালিয়ানের ৫টি কোম্পানীর সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ২০৪ জন যুক্ত হয়ে ৫টি ভাগে বিভক্ত হয়ে এই বিভীষিকাময় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে কৃষ্ণপুরের আলাউদ্দিন শাহজাহান ওরফে বাদশাহ, পিয়ারপুরের রঞ্জিত গুপ্তসহ ২৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ বরণ করেন।

গোয়াতলা যুদ্ধ:

ময়মনসিংহের বিদ্যুৎ স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ১৭ই আগস্ট ১৯৭১ অপারেশন শেষে ফেরার পথে গোয়াতলা বাজার সংলগ্ন নদীতে নৌকায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের অতর্কিত হামলার কবলে পরে। এ যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সকল অস্ত্রই নদীতে নিমজ্জিত হয়। বাকী কয়েকটি অস্ত্র ও গ্রেনেড দিয়ে প্রায় ৫ ঘন্টা শত্রুদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে স্থানীয় জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করা হয়।

ফুলবাড়ীয়া যুদ্ধ:

২৭ এপ্রিল ১৯৭১ ফুলবাড়ীয়া থানার লক্ষ্মীপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ২৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। তাছাড়া উক্ত থানার উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহের মধ্যে রাজামাটিয়া, আছিম, কেশরগঞ্জ যুদ্ধ অন্যতম। মুক্তাগাছা থানার বটতলা, চরাঘাটি, মুক্তাগাছা থানা ও ভিটি বাড়ী যুদ্ধ অন্যতম।

এছাড়া ৬ আগস্ট ১৯৭১ সালে বান্দরকাটা যুদ্ধ এবং ১৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নান্দাইল যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সকল স্তরের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৭ ডিসেম্বর শেরপুর, ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোণা এবং ১০ ডিসেম্বর জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলা শত্রুমুক্ত হয়।